بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০১ মার্চ, ২০২৪ মোতাবেক ০১ আমান, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উহুদের যুদ্ধের অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আহত ও শহীদদের একত্রিত করেন। আর আহতদের চিকিৎসা করা হয় এবং শহীদদের দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন তিনি জানতে পারেন যে, মক্কার অত্যাচারী কাফিররা কতক মুসলমান শহীদের নাক, কান কেটে দিয়েছে। যেমন, যাদের নাক কান কাটা হয়েছে তাদের মাঝে স্বয়ং তাঁর (সা.) চাচা হামযা (রা.)ও ছিলেন। তিনি (সা.) এই দৃশ্য দেখে দুঃখভারাক্রান্ত হন। তিনি (সা.) বলেন, কাফিররা স্বয়ং নিজেদের ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষেত্রে সেই প্রতিশোধকে বৈধ করে দিয়েছে যেটিকে আমরা অবৈধ মনে করতাম। কিন্তু খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তখন তাঁর (সা.) প্রতি ওহী হয় যে, কাফিররা যা কিছু করে তা তাদেরকে করতে দাও। তুমি দয়া ও ন্যায়বিচারের আঁচল সর্বদা আঁকড়ে ধরে রেখো।

এটি হলো ইসলামের শিক্ষা। হযরত হামযা (রা.)-র দাফন-কাফন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফন হিসেবে হযরত হামযা (রা.)-কে একটি কাপড়েই সমাহিত করা হয়। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণনা করেছি অবশ্য কিছু কথা রয়ে গিয়েছিল, যখন তার মাথা ঢাকা হতো উভয় পা হতে কাপড় সরে যেতো। আর যখন চাঁদর পায়ের দিকে টানা হতো তখন তার চেহারা থেকে কাপড় সরে যেতো। তখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, তার মুখমণ্ডল ঢেকে দেয়া হোক আর পায়ের ওপর হারমাল বা ইযখার ঘাস রেখে দেয়া হোক। হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-কে, যিনি তার ভাগ্নে ছিলেন, একই কবরে সমাহিত করা হয়। মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম হযরত হামযা (রা.)-র জানাযার নামায পড়ান। শহীদদের জানাযার নামায পড়া বা না পড়া সম্পর্কে এটি হলো উদ্ধৃতি, যা আমি গত খুতবায় বর্ণনা করেছি।

মৃতদের জন্য যে ক্রন্দন ও বিলাপ করা হয়, মহানবী (সা.) কতই না প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় এটিকে নিষেধ করেছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, আর এটি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-র বর্ণনা যে, মহানবী (সা.) যখন উহুদ থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি (সা.) শুনতে পান যে, আনসারের নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য ক্রন্দন ও বিলাপ করছে। তিনি (সা.) বলেন, ব্যাপার কী, হামযার নাম নিয়ে ক্রন্দন করার কেউ নাই না-কি? আনসারের নারীরা যখন জানতে পারেন তখন তারা হযরত হামযা (রা.)-র শাহাদতে বিলাপ করার জন্য একত্রিত হন। এরপর মহানবী (সা.) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি কিছুটা দূরত্বে ছিলেন, আমার মনে হয় মসজিদেই ছিলেন। তিনি যখন জাগ্রত হন তখন সেই নারীরা সেভাবেই ক্রন্দনরত ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আজ হামযার জন্য তারা কী কেঁদেই যাবে, বন্ধ করবে না। তাদেরকে বলে দাও, যেন বাড়ি ফিরে যায়। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে নির্দেশ দেন, নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাও। আর আজকের পর কোনো মৃত্যু বরণকারীর জন্য মাতম বা বিলাপ করবে না।

এভাবে মহানবী (সা.) মৃতদের জন্য বিলাপ করা অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন আর সকল প্রকার ক্রন্দন ও বিলাপ নিষিদ্ধ আখ্যা দেন। এভাবে পরম প্রজ্ঞার সাথে মহানবী (সা.) আনসারের নারীদের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাদেরকে তাদের স্বামী ও ভাইদের মৃত্যুতে মাতম করতে নিষেধ করার পরিবর্তে হযরত হামযা (রা.)-র উল্লেখ করেন যে, তার জন্য কাঁদার কেউ কি নেই? মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)-র শাহাদতের পর তার লাশের অসম্মান বা অবমাননা দেখে খুবই মর্মাহত ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, এই আনসার নারীরা বিলাপ করা বন্ধই করছে না তখন তিনি (সা.) এই প্রথা নির্মূল করার জন্য, (যা কুপ্রথাই ছিল,) নিজের আদর্শ

উপস্থাপন করেন আর তাদেরকে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেন। (এটি) এমন শিক্ষা যা ছিল খুবই কার্যকরী। হযরত হামযা (রা.)-র বিয়োগ বেদনায় মহানবী (সা.) জীবনের শেষ পর্যন্ত জর্জরিত ছিলেন, তিনি সর্বদা এর উল্লেখ করতেন।

হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) হযরত হামযা (রা.)-র শাহাদতে নিজের শোকগাথায় বলেছিলেন, **'আমার চোখ অশ্রু বিসর্জন দেয়, আর হামযার মৃত্যুতে তাদের ক্রন্দন করার বৈধ অধিকারও রয়েছে। কিন্তু খোদার সিংহের মৃত্যুতে কান্নাকাটি এবং চিৎকার চেঁচামেচিতে কী-ইবা লাভ হতে পারে। সেই খোদার সিংহ হামযা, যে সকালে তিনি শহীদ হন জগৎ বলে উঠে যে, এই বীরের শাহাদতই প্রকৃত শাহাদত।'**

হযরত মুসআব (রা.)-র দাফন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন হযরত মুসআব (রা.)-র লাশের কাছে আসেন তখন তার লাশ উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। মহানবী (সা.) তার পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করেন,

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

অর্থাৎ, মু'মিনদের মাঝে এমন পুরুষরা রয়েছে যারা যে বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে তারা সেটিকে পূর্ণ করে দেখিয়েছে। অতএব, তাদের মাঝে সে-ও রয়েছে যে নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করেছে আর তাদের মাঝে সে-ও রয়েছে যে এখনো অপেক্ষারত আছে। আর তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনে নি (সূরা আল-আহযাব: ২৪)। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, **ইন্না রাসূলাল্লাহি ইয়াশহাদু আন্নাকুমুশ্ শুহাদাউ ইনদাল্লাহি ইয়াওমাল ক্বিয়ামা**। অর্থাৎ, খোদার রসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তোমরা কিয়ামত দিবসেও আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে শহীদ। অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তাদের দর্শন করে নাও এবং তাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করো। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যে-ই তাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবে তারা তাদের সালামের উত্তর প্রদান করবেন। হযরত মুসআব (রা.)-র ভাই হযরত আবু রূম বিন উমায়ের, হযরত সুয়ায়বাত বিন সা'দ এবং হযরত আমের বিন রবীয়্যা (রা.) হযরত মুসআব (রা.)- কে কবরে নামান।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লিখেন,

"উহুদের শহীদদের মাঝে একজন ছিলেন মুসআব বিন উমায়ের (রা.)। তিনি ছিলেন সেই সর্বপ্রথম মুহাজির, যিনি মদীনায় ইসলামের মুবাল্লিগ বা প্রচারক হিসেবে এসেছিলেন। অজ্ঞতার যুগে মুসআব (রা.) মক্কার যুবকদের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর ও মার্জিত পোশাক–পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন আর প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মাঝে জীবন কাটাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) একবার তার দেহে একটি পোশাক দেখেন যেটিতে বেশ কিছু তালি দেওয়া ছিল। মহানবী (সা.)-এর তখন তার সেই পূর্বের যুগের কথা স্মরণ হলে তিনি (সা.) অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন, অর্থাৎ তাঁর চোখে পানি নেমে আসে। উহুদের যুদ্ধে যখন হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হন তখন তার কাছে এতটুকু কাপড়ও ছিল না যা দ্বারা তার দেহ ঢাকা যেত। পা ঢাকলে মাথা খালি হয়ে যেত, মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত। তখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে মাথা কাপড় দ্বারা ঢেকে পা ঘাস দ্বারা আবৃত করা হয়।

উহুদের দিন যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) একটি দোয়াও করেছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত রিফা' বিন রাফে' যুরাকী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের দাফনকার্য সম্পন্ন করার পর নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন, তখন মুসলমানরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ছিলেন। (তাদের) অধিকাংশই আহত ছিলেন। আর বনু সালামা এবং বনু আব্দেল আশআল গোত্রের (লোকেরাই) বেশি আহত ছিল। এছাড়া তাঁর সাথে চৌদ্দজন মহিলাও ছিলেন। উহুদ (পাহাড়ের) নীচে পৌঁছার পর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সবাই সারিবদ্ধ হও যাতে আমি আমার মহান প্রভুর প্রশংসা কীর্ত্তন করতে পারি। তখন তাঁর পেছনে পুরুষরা সারিবদ্ধ হয় আর তাদের পেছনে মহিলারা (সারিবদ্ধ হয়ে) দাঁড়ায়। এরপর মহানবী (সা.) এসব বাক্য বলেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّه، اَللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبْعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ. اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِي لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ (أي الفقر). اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ وَالْغِنٰى يَوْمَ الفَاقَةِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا. اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوْبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ، إِلٰهَ الْحَقِّ-آمين

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! যাবতীয় সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। হে আল্লাহ্! যে জিনিসকে তুমি সম্প্রসারিত করো তাকে কেউ সংকীর্ণ করতে পারে না। আর যে জিনিসকে তুমি সংকীর্ণ করো তাকে কেউ সম্প্রসারিত করতে পারে না। আর যাকে তুমি পথভ্রষ্ট করে দাও তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আর যাকে তুমি হিদায়াত দাও তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যা তুমি রোধ করে রাখো বা না দাও তা কেউ দিতে পারে না। আর যা তুমি দান করো তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর যাকে তুমি দূরে ঠেলে দাও তাকে কেউ নৈকট্য প্রদান করতে পারে না। আর যাকে তুমি নৈকট্য দান করো তাকে কেউ দূরে ঠেলে দিতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি তোমার কল্যাণরাজি, অনুগ্রহ, স্বীয় কৃপা ও রিয্ক-এ স্বাচ্ছন্দ্য দান করো। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট তোমার এমন সুপ্রতিষ্ঠিত অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি যা কখনো ফিরিয়ে নেয়া হবে না কিংবা শেষ হবে না। হে আল্লাহ্! আমরা এই দারিদ্রাবস্থায় তোমার কাছে অনুগ্রহরাজি যাচনা করছি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট ভয়ের দিনে নিরাপত্তা যাচনা করছি। আর উপোসের দিনে প্রাচুর্যতা যাচনা করছি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সেসব জিনিসের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তুমি আমাদের দান করেছ। আর সেসব জিনিসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা তুমি আমাদের জন্য বারণ করেছ। হে আল্লাহ্! ঈমানকে আমাদের প্রিয় বানিয়ে দাও আর এটি আমাদের হৃদয়ে প্রোথিত করে দাও। আর কুফর, পাপ ও অবাধ্যতাকে আমাদের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় করে দাও আর আমাদেরকে সরল-সোজা পথে পরিচালিতদের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও আর আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় পুনরুত্থিত করো। আর আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করো যেন আমরা লাঞ্ছিত না হই আর না-ই নৈরাজ্যের শিকার হই। হে আল্লাহ্! সেসব কাফিরকে ধ্বংস করে দাও যারা তোমার রসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আর তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাদের ওপরে তোমার শাস্তি ও আযাব অবতীর্ণ করো। হে আল্লাহ্! হে সত্যিকার উপাস্য! আহলে কিতাব কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দাও, আমীন।

এই দোয়াটি তিনি (সা.) তখন সবাইকে একত্রিত করে পাঠ করেন। উহুদের যুদ্ধে মহিলা সাহাবীদের ভূমিকা সম্পর্কে আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছিলাম, (আজ) আরো কিছু উল্লেখ করছি। উহুদের যুদ্ধে যেখানে পুরুষরা আত্মনিবেদনের ইতিহাস রচনা করেছেন সেখানে নারীরাও এই সেবায় মুসলমান সৈনিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) সম্পর্কে রেওয়ায়েতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেমন, হযরত মুত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হান্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদ অভিমুখে যাত্রার দিন মহানবী (সা.) পথিমধ্যে মদীনার নিকটবর্তী **'শায়খাইন'** নামক একটি স্থানে রাত্রিযাপন করেন। সেখানে হযরত উম্মে সালামা (রা.) (ছাগলের) একটি ভুনা রান নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.) তা থেকে আহার করেন। এরপর 'নবীয' (এক প্রকার পানীয়) আনেন আর মহানবী (সা.) 'নবীয' পান

করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, এটি 'হারীরা'র মতো কোনো পানীয় ছিল। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এবং আমার মাতা উম্মে সুলায়েম (রা.)-কে দেখেছি। তারা মশক ভর্তি করে পানি আনতেন এবং তৃষ্ণার্তদের পান করাতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন লোকেরা যখন পরাজয়ের পর ছত্রভঙ্গ হয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে দূরে চলে যায় আমি হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) এবং হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.)-কে দেখেছি তারা নিজেদের কাপড় বা পরিধেয় বস্ত্র শক্তকরে কোমরে বেঁধে রেখেছিলেন আর আমি তাদের উভয়ের পাদাভরণ দেখছিলাম। তারা উভয়ে দ্রুতবেগে মশক নিয়ে যাচ্ছিলেন। এছাড়া আরেকটি বর্ণনায় অন্য একজন বলেন, তারা উভয়ে নিজেদের কোমরে করে মশক বহন করছিলেন এবং তারা উভয়ে তা লোকদের মুখে ঢেলে দিতেন অর্থাৎ পানি পান করাতেন। এরপর তারা উভয়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় সেগুলো ভরে নিয়ে আসতেন এবং লোকদের মুখে পানি ঢেলে দিতেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-র মাতা উম্মে সুলায়েত (রা.)ও অনেক দূর থেকে পানির মশক ভরে নিয়ে আসতেন এবং অপরদিকে আহত ও পিপাসার্তদের পানি পান করাতেন। হযরত উম্মে আতীয়া (রা.)ও এই সেবা প্রদান করেছিলেন। অন্য কয়েকজন মহিলা রীতিমতো বর্শা ও তরবারি হাতে নিয়ে শত্রুদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধও করেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন, হযরত উম্মে আম্মারা (রা.), যেমনটি আমি বিগত খুতবায় বর্ণনা করেছি। তিনি যখন ইবনে কামিয়াকে মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণোদ্যত দেখতে পান তখন নির্ভীকভাবে আরবের দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীকে প্রতিরোধে উদ্যত হন এবং তার ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ করে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

ইবনে আবী শেয়বা এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল উভয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেন, উহুদের দিন মহিলারা মুসলমানদের এগিয়ে যাওয়ার পর আহত মুশরিকদের মৃত্যু নিশ্চিত করতেন। কোনো কোনো মহিলা সাহাবী (রা.) যুদ্ধের পরে উহুদ প্রান্তরে আসেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, মুশরিকদের চলে যাবার পর কিছু মহিলা সাহাবীদের কাছে আসেন, তাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.)-কে দেখে তিনি জড়িয়ে ধরেন। তিনি তাঁর ক্ষত ধৌত করতে আরম্ভ করেন এবং হযরত আলী (রা.) ঢালের সাহায্যে পানি ঢালেন, কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। (তাই) হযরত ফাতেমা (রা.) চাটাইয়ের কিছু অংশ পুড়ে ছাই তৈরী করে ক্ষতস্থানে লগিয়ে দেন, অবশেষে তা ক্ষতস্থানে লেপটে গেলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) উহুদ যুদ্ধের সংবাদ নেয়ার জন্য মদীনার মহিলাদের সাথে বাড়ি থেকে বের হন। তখনও পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি। হযরত আয়েশা (রা.) যখন 'হাররা' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তার সাথে হিন্দ বিনতে আমর (রা.)-র সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-র বোন ছিলেন। হযরত হিন্দ (রা.) তার উটনীকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই উটনীর পীঠে তার স্বামী হযরত আমর বিন জমুহ (রা.), পুত্র হযরত খাল্লাদ বিন আমর (রা.) এবং ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-র মরদেহ ছিল। তিনজনের লাশ ছিল উটের পিঠে। হযরত আয়েশা (রা.) যখন রণক্ষেত্রের সংবাদ জানার চেষ্টা করছিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী অবস্থায় লোকদের পেছনে রেখে এসেছ তা কি তুমি জানো? এর উত্তরে হযরত হিন্দ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) সুস্থ আছেন, কাজেই সব বিপদাপদ এখন তুচ্ছ। নিজের তিনজন নিকটাত্মীয় যথা: স্বামী, সন্তান এবং ভাইয়ের শবদেহ বহন করছেন কিন্তু (তাঁর মানসিক অবস্থা) জিজ্ঞেস করাতে উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) নিরাপদ থাকলেই হলো। এদেরকে তো আমি এখনই দাফন করব; মহানবী (সা.) যেহেতু ভালো আছেন তাই এগুলো কোনো বিষয়ই না!

হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন আমি এটি দেখার জন্য বের হই যে, মানুষ কী করছে। আমার কাছে পানি ভর্তি মশক ছিল যেটি আমি আহতদের পান করানোর জন্য সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। সে-সময় তিনি (সা.) সাহাবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং মুসলমানদের পাল্লা ভারি ছিল। হঠাৎ করেই মুসলমানদের পরাজয় (শুরু) হয়।

(এটি দেখে) আমি তাৎক্ষণিকভাবে মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে আরম্ভ করি। আমি তরবারি দ্বারা শত্রুদের মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতে বাধা দিচ্ছিলাম। পাশাপাশি আমি ধনুক দিয়ে তিরও নিক্ষেপ করছিলাম, এমতাবস্থায় আমি নিজেও আহত হয়ে যাই।

একজন জীবনীকার বর্ণনা করেন, যে মহিলা উহুদের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ করেন এবং পরাজয়ের সময় মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে তিরন্দাজী করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উম্মে আম্মারা (রা.); আম্মারা নুসায়বা মাযিনিয়্যা ছিলেন। নুসায়বা মাযিনিয়্যা অর্থাৎ হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) ছাড়া অন্য কোনো মহিলার ক্ষেত্রে একথা সাব্যস্ত নয় যে, তিনি উহুদের দিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে হ্যাঁ, ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, মুসলমানদের কিছু মহিলা মুশরিকরা সরে গেলে মদীনা থেকে রণক্ষেত্রে যান এবং তারা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা এবং পানি পান করানো ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হন। সেসব মহিলার মাঝে ছিলেন মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.), তাঁর (সা.) কন্যা ফাতেমাতুয্ যাহরা (রা.)। ইমাম বুখারী একজন রাবীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি হযরত আয়েশা এবং হযরত উম্মে সুলায়েমকে দেখেছি। তারা উভয়ে দ্রুততার সাথে পানির মশক পিঠে তুলে দৌড়ে আসতেন এবং লোকদের মুখে পানি ঢেলে দিতেন। (সেগুলো খালি হয়ে গেলে) পুনরায় সেগুলো ভরে এনে পুনরায় মানুষের মুখে পানি ঢেলে দিতেন।

একজন লেখক লিখেন, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয় তখন মুসলমানদের কিছু মহিলা সাহায্য-সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ঐসব মহিলার মাঝে মহানবী (সা.)-এর সেবিকা হযরত উম্মে আয়মান (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন, যখন মুসলমানদের পরাজিত দল মদীনায় ঢোকার চেষ্টা করে তখন উম্মে আয়মান (রা.) তাদের মুখোমুখি দাঁড়ান এবং মুঠো মুঠো মাটি তাদের মুখে নিক্ষেপ করতে থাকেন আর কতককে ধমক দিয়ে বলেন, তোমারা যদি যুদ্ধ করতে না পারো তাহলে এই চরকা নাও; (চরকা হলো, যেটি দিয়ে মহিলারা সুতা কাটে, সুতা বানায়) এবং তোমাদের তরবারিগুলো আমাদেরকে দিয়ে দাও আর তোমরা মহিলাদের কাজ করো। একথা বলেই তিনি দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.)-এর চারপাশে তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন হযরত উম্মে আয়মান (রা.) আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এমনকি যুদ্ধ চলাকালীন সেবা-শুশ্রূষার সময় তাদের দেহে তির এসে বিদ্ধ হতো। ইবনে আসীরের পুস্তক আল-কামেল ফীত-তারীখের (বর্ণনামতে) হযরত উম্মে আয়মান (রা.) যোদ্ধাদের মাঝে যারা আহত হতেন তাদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। এ সময় হিব্বান বিন আরিকা তাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে, ফলে তিনি পড়ে যান এবং অনাবৃত হয়ে পড়েন; এতে খোদার শত্রু খুব হাসাহাসি করে। মহানবী (সা.) এটি দেখে ভীষণ মর্মাহত হন। তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে একটি তির দেন যেটির অগ্রভাগে ফলা ছিল না এবং বলেন, তাকে (তথা হিব্বানকে) লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করো। হযরত সা'দ (রা.) তাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করেন ফলে সেই তির হিব্বানের বুকে গিয়ে আঘাত করে আর সে চিৎ হয়ে পড়ে যায় এবং উলঙ্গ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) এটি দেখে মুচকি হাসেন। তিনি (সা.) বলেন, সা'দ উম্মে আয়মানের প্রতিশোধ নিয়েছে।

একজন জীবনীকার লিখেছেন, যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে কতিপয় মু'মিন নারী যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান। জীবনীকার লিখেছেন, সেই মহিয়সী নারী তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান যখন মুসলমানরা মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং যখন বিজয়ের লক্ষ্মণাবলি প্রকাশ পেতে থাকে।

সারকথা হলো, **প্রাথমিকভাবে** তারা মুসলমান সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মুসলমান নারীরা সম্ভবত উহুদ প্রান্তরে সেই সময় গিয়ে থাকবেন যখন মুসলমানদের প্রাথমিক বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। তারা এ সংবাদ শুনে উহুদ অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু ততক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র পাল্টে যায়। এর ফলে মুসলমান নারীরাও যুদ্ধে অংশ নেয়। **দ্বিতীয়ত,** এটিও হতে পারে যে, যখন মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছে তখন এই নিবেদিতপ্রাণ নারীরাও ব্যাকুল হয়ে উহুদ অভিমুখে যাত্রা করে আর এরপর তারা যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে এসে

অংশগ্রহণ করে থাকবে; যখন এক দিকে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ অব্যাহত ছিল আর অপরদিকে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজ চলছিল। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

উহুদের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের দিন মহানবী (সা.) তার জন্য নিজের পিতামাতাকে একত্র করেন। তিনি বলেন, মুশরিকদের মাঝে এক ব্যক্তি মুসলমানদের মাঝে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, তুমি তির নিক্ষেপ করো, তোমার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গিত। পিতামাতাকে একত্রিত করার অর্থ হলো, তোমার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি ফলাবিহীন সেই তির তার দিকে নিক্ষেপ করি যার ফলে সে নিহত হয় এবং সে উলঙ্গ হয়ে যায় আর আমি দেখি, মহানবী (সা.) হাসছেন।

আরেকটি রেওয়ায়েতে এ ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই মুশরিক যার নাম কতক ইতিহাসের পুস্তকে হিব্বান বলা হয়েছে– সে একটি তির নিক্ষেপ করে যা হযরত উম্মে আয়মান (রা.)'র দেহের এক পাশে বিদ্ধ হয়, যিনি আহতদের পানি পান করানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন হিব্বান হাসতে থাকে। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে নিক্ষেপ করার জন্য একটি তির এগিয়ে দেন যা হিব্বানের গলায় বিদ্ধ হয় এবং সে পেছনে উল্টে পড়ে যার ফলে তার নগ্নতা প্রকাশ পেয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) হেসে ফেলেন। মূলত মহানবী (সা.)-এর এই আনন্দ ও হাসি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ছিল, কেননা তিনি এক ভয়ংকর শত্রুকে এমন এক তির দ্বারা ঘায়েল করেন যার ফলাও ছিল না। একটি সাধারণ লাঠি ছিল যা তাকে হত্যা করেছে।

একজন লেখক মহানবী (সা.)-এর সাহসিকতা এবং বিচক্ষণতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে কুরাইশের অশ্বারোহীরা গিরিপথে অবস্থানকারী আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তার সাথিদের শহীদ করে ইসলামী সৈন্যদলের পেছন থেকে এসে হামলা করে। সে সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে কেবলমাত্র নয়জন সাহাবী ছিলেন। অন্যান্য মুজাহিদরা শত্রুদের পিছু ধাওয়া করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যখনই খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং কুরাইশের অশ্বারোহীদের দেখেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখনও তাঁর (সা.) প্রতি অশ্বারোহীদের দৃষ্টি পড়ে নি, সে কারণে নিজেকে তিনি খুব সহজেই নিরাপদ আশ্রয় নিতে যেতে পারতেন; কিন্তু এরূপ করলে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশংকা ছিল। এজন্য তিনি (সা.) যে সিদ্ধান্ত নেন তা হলো, পলায়নের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে উচ্চৈঃস্বরে তকবীর-ধ্বনি দেন যেন ইসলামী সেনাবাহিনী তা শুনে পেছনে দেখে। যখন ইসলামী সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকটা সামনের দিকে ছিল, তাদের পূর্বে কুরাইশ অশ্বারোহীদের পর্যন্ত তাঁর (সা.) আওয়াজ পৌঁছে যাওয়াটাও অবধারিত ছিল। পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রকাশিত হয়; বিস্ময়কর ও তুলনাহীন সাহসিকতা স্পষ্ট হয়। কেননা তিনি (সা.) নিজের প্রাণকে ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়ে সাহাবীদের প্রাণ রক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সাহাবীদেরকে ডাকেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! এদিকে এসো! তাঁর (সা.) কণ্ঠস্বর পুরো রণক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সাহাবীরাও পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা অনুধাবন করেছিলেন। যেহেতু তারা যথেষ্ট দূরে অবস্থান করছিলেন সে কারণে কুরাইশ অশ্বারোহী দলের একটি অংশ মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করে বসে আর অন্য অশ্বারোহীরা দ্রুততার সাথে মুসলমানদের ঘিরে ফেলতে শুরু করে।

মহানবী (সা.)-এর আহত অবস্থাতেও চেতনা ঠিক রাখা এবং সাহাবীদের দিকনির্দেশনা প্রদান, তাদের সাহস জোগানোর উল্লেখও পাওয়া যায়। উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস, যে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-র ভাই ছিল, সে মহানবী (সা.)-এর ওপর একটি পাথর সজোরে নিক্ষেপ করে যা তাঁর মুখমণ্ডলে আঘাত করে। তাঁর (সা.) সামনের সারির নীচের পাটির দুটি দাঁত এবং ছেদন দাঁতের মধ্যবর্তী দাঁতও ভেঙ্গে যায়। একইসাথে এর কারণে নীচের ঠোঁট ফেটে যায়। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, দাঁতের একটি অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল, গোড়া থেকে উপড়ে যায় নি। যাহোক, মহানবী (সা.) উতবা বিন আবী ওয়াক্কাসের

বিরুদ্ধে এই দোয়া করেন, **আল্লাহুম্মা লা ইয়াহুলু আলাইহিল হাওলু হাত্তা ইয়ামুতা কাফিরান**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এক বছর অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই তাকে কাফির অবস্থায় মৃত্যু দাও। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই দোয়াটি গ্রহণ করেন আর সেদিনই হাতেব বিন আবি বালতা (রা.) তাকে হত্যা করেন। হযরত হাতেব (রা.) বলেন, যখন আমি উতবা বিন আবী ওয়াক্কাসের এই নির্লজ্জ ধৃষ্টতা দেখি তখন আমি তৎক্ষণাৎ মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করি, উতবা কোথায় গেছে? তিনি (সা.) যেদিকে সে গিয়েছিল সেদিকে ইশারা করেন। আমি তৎক্ষণাৎ তার পিছু নেই। পরিশেষে তাকে একটি স্থানে ধরে ফেলতে সক্ষম হই। আমি তার ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করি যার ফলে তার মস্তক কেটে দূরে গিয়ে পড়ে। আমি এগিয়ে গিয়ে তার তরবারি ও ঘোড়াটি জব্দ করি এবং সেগুলো নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হই। তিনি (সা.) এই সংবাদ শুনে দুইবার বলেন, **রাযিয়াল্লাহু আনকা, রাযিয়াল্লাহু আনকা**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) অর্থাৎ নুসায়বা (রা.) তার স্বামী হযরত যায়েদ বিন আসেম (রা.) এবং উভয় পুত্র খুবায়েব (রা.) ও আব্দুল্লাহ্ (রা.)– সবাই যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন। পূর্বেও আমি এর উল্লেখ করেছি। মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের পরিবারের প্রতি রহমত (কল্যাণ) অবতীর্ণ করুন। একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, আল্লাহ্ তোমাদের পরিবারকে আশিসমণ্ডিত করুন। তখন হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) তাঁর নিকট নিবেদন করেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য দোয়া করুন– আমরা যেন জান্নাতে আপনার সাথি হই। তিনি (সা.) দোয়া করে বলেন, **হে আল্লাহ্! তাদেরকে জান্নাতে আমার বন্ধু ও সাথি বানিয়ে দাও**। সে সময় হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) বলেন, **পৃথিবীতে আমার সাথে কী ঘটবে সে ব্যাপারে আমার আর ভ্রুক্ষেপ নেই**। এই হলো সেসব নিষ্ঠাবান মহিলা সাহাবীর সাহস এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত, আর এটিরও (প্রমাণ) যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার বিপরীতে (তাদের কাছে) পৃথিবী ছিল তুচ্ছ। বস্তুবাদী নারীরা জাগতিক মোহ রাখে, কিন্তু তারা ছিলেন ধর্মের জন্য ত্যাগী নারী।

বর্ণনার এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

নামাযের পর আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়াবো, তাদের স্মৃতিচারণও করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে মোকাররম গোসসান খালিদ আন-নকীব সাহেবের যিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র ও একজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র যুগে তিনি স্বয়ং বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তার তবলীগে তার পুত্র বয়আত করেছিলেন। তার স্ত্রী ও কন্যা এখনো বয়আত করেন নি।

মরহুমের পুত্র হুসামুন নকীব সাহেব লিখছেন, আমার পিতা আমার বন্ধু এবং আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনিই আমাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পথ দেখিয়েছেন। নব্বইয়ের দশকে আমার পিতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র অনুষ্ঠান **'লিকা মাআল আরব'**-এর মাধ্যমে জামা'তের সাথে পরিচিত হন। এর পূর্বে আমার পিতার ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এতটুকু ছিল যে, ধর্ম কেবল উত্তম ব্যবহার করার নামান্তর। কিন্তু যখন তিনি **'লিকা মাআল আরব'** অনুষ্ঠান দেখেন তখন তিনি বলেন, যদি কোথাও ধর্মের কোনো পুণ্যবান আলেম থেকে থাকেন তাহলে তিনি হচ্ছেন এই ব্যক্তি, অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)। যদি কোথাও সঠিক ইসলাম ধর্ম থেকে থাকে তাহলে তা এটি যা এই লোকেরা বলছেন। তখন আমার পিতার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর ছিল। তখন তিনি নামায পড়া শিখেছেন, কেননা ইতঃপূর্বে তিনি কখনো নামায পড়েন নি। এরপর নামাযের ওপর তিনি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হন যে, আমার মনে পড়ে না তিনি কখনো তাহাজ্জুদ নামাযও পরিত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ২০০৩ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। এর একমাস পর তিনি আমাকেও বুঝাতে সক্ষম হন। এটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র জীবনের শেষ সময়ের কথা।

এরপর লিখেন, আব্দুল হাই ভাট্টি সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্‌র মাধ্যমে যখন আমার পিতা ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অবগত হন, তাৎক্ষণিকভাবে নেযামে ওসীয়্যতে অন্তর্ভুক্ত হন। তখন তাকে বলা হয়েছিল, প্রথমে আল-ওসীয়্যত বইটি পড়ে নিন। তিনি উত্তরে বলেন, আমি বইটি অবশ্যই পড়ব আর বুঝারও চেষ্টা করব, কিন্তু এর ফলে এই ব্যবস্থাপনার প্রতি আমার ভালোবাসা ও এর সাথে সম্পৃক্ত হবার আগ্রহে কোনো ঘাটতি আসবে না। বরং এর অধ্যয়ন, এর প্রতি বিশ্বাস আরো বৃদ্ধি করবে; এর সত্য হবার ব্যাপারে বিশ্বাস তো আমার পূর্ব থেকেই আছে। জামা'তের সাথে যখন আমার পিতা পরিচিত হন তখন থেকেই জামা'তের বইপুস্তকের যা কিছু পেতেন নিয়মিত তা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করতেন। এরপর সেটি বুঝে কম্পিউটারে নিজের পছন্দ অনুযায়ী নোট তৈরি করতেন। আমাকে অধিকাংশ সময় বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এতটা দীর্ঘজীবী করুন যেন আমি মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাদের সকল বইপুস্তক পড়ে শেষ করতে পারি; যেন আমি বিগত বছরগুলোতে যা হারিয়েছি তা পূর্ণ করতে পারি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র তফসীরে কবীরের প্রতি মরহুমের গভীর ভালোবাসা ছিল এবং তিনি অসংখ্যবার এটি পাঠ করেছেন। তার পুত্র বলেন, আমার যখনই কোনো বিষয়ে সাহায্য দরকার হতো, আমার পিতা সে বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ও তাঁর খলীফাদের পুস্তকের আলোকে সবিস্তারে ব্যাখ্যাসহ আমায় বের করে দিতেন। মরহুম জুমআর খুতবার অনুবাদ রি-চেক বা পরিমার্জনের কাজও করতেন; আমার যে লাইভ খুতবা যায়– সে খুতবার কথা বলছি। একইভাবে আরবী ডেস্কের পক্ষ থেকে পরিমার্জনের কাজের জন্য তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন।

তিনি বলেন, আমি কখনো বলতাম যে, বিশ্রাম নিন। তিনি উত্তরে বলতেন, আমি তো জামা'তের কাজের মাঝেই আরাম খুঁজে পাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের পুস্তকসমূহের অনুবাদ পরিমার্জনের সময় প্রায়ই তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। বয়আতের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একজন সাহাবীর ঘটনা শোনান যে, তিনি বয়আত করে নিজের গ্রামে যান এবং প্রতিটি বাড়ির দরজায় কড়া নাড়েন আর সবার কাছে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের বার্তা পৌঁছান। এরপর আমার শ্রদ্ধেয় পিতারও একই রীতি ছিল, যার সাথেই তার সাক্ষাৎ হতো, সে সাক্ষাৎ পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও তাকে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের বিষয়ে অবশ্যই বলে দিতেন। তিনি বলতেন, আমার কাজ হলো মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের সুসংবাদ পৌঁছানো। কেউ যদি বুঝে তো ভালো, অন্যথায় আমি বীজ ঠিকই ছড়িয়ে দিয়েছি। সেটি উদ্‌গত করা হিদায়াতদাতা খোদা তা'লার কাজ।

সিরিয়ার ওয়াসীম মোহাম্মদ সাহেব তার ব্যাপারে লিখেন, জুমুআর পর মরহুম মনোমুগ্ধকর দরস দিতেন। ২০১৯–২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি সেক্রেটারি এশায়াত হিসেবে সেবা প্রদান করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠের প্রতি মরহুমের গভীর আগ্রহ ছিল, বরং তিনি নিজেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকসমূহের কঠিন শব্দাবলির অর্থ ও ব্যাখ্যা লিখতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র তফসীরে কবীরের অর্থ অধ্যয়ন করে তা থেকে **'কাসাসুল আম্বিয়া'** অংশটুকু পৃথক করে সংক্ষিপ্তাকারে একটি পুস্তকরূপে উপস্থাপন করেন যা জামা'তের (আরবী) ওয়েবসাইটে বিদ্যমান আর জামা'তের সদস্যরা, বিশেষত বাচ্চারা এ থেকে অনেক উপকৃত হয়।

আত-তাকওয়া ম্যাগাজিনের সম্পাদক ওবাদা বারবূশ সাহেব বলেন, মরহুম অগণিত গুণের অধিকারী ছিলেন। খিলাফতের সাথে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। বয়োবৃদ্ধ এবং চাকরীজীবি হওয়া সত্ত্বেও মরহুম সেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে আত-তাকওয়া ম্যাগাজিনে সেবা প্রদান করতেন আর যখনই কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হতো সেটিকে পালন করা নিজের সৌভাগ্য জ্ঞান করতেন। মরহুম সাত বছর পর্যন্ত আত-তাকওয়া

ম্যাগাজিনের পুরনো সংখ্যা টাইপ করা এবং সেগুলোকে কম্পিউটারাইজড করতে আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমাসুলভ ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন, মর্যাদা উন্নীত করুন; তার সন্তানদের স্বপক্ষে তার দোয়া কবুল করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ স্নেহের নওশাবা মোবারক সাহেবার যিনি মুরব্বী সিলসিলাহ্ জালীস আহমদ সাহেব স্ত্রী ছিলেন, তিনি এখানে (অর্থাৎ লন্ডনে) আর্কাইভ ও আল-হাকাম এ কাজ করছেন। সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পথে রাবওয়া এবং লাহোরের মাঝামাঝি একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার উত্তরসূরি হিসেবে স্বামী, পিতামাতা ছাড়াও চার ভাই ও দুই বোন রয়েছে। মরহুমার ওসীয়্যতের কার্যক্রম চলমান ছিল, হঠাৎ মৃত্যু বরণ করেন। যাহোক, সে কার্যক্রম চলছে। তার ওসীয়্যত হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মূসীয়া ছিলেন। তার স্বামী স্নেহের জালীস আহমদ লিখেন, খাকসার আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞ, কেননা আল্লাহ্ তা'লা অধমকে এমন একজন স্ত্রী দান করেছিলেন যিনি অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সর্বদা ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কখনও আমার কাছে কোনো চাহিদা উত্থাপন করেন নি। সর্বদা অন্যের আনন্দের কারণ হতেন। জামা'তের বিভিন্ন পদে সেবা প্রদান করেছেন। সহকারী সেক্রেটারি মাল এবং সহকারী সেক্রেটারি ওসীয়্যত হিসেবে সহযোগিতা করেছেন। কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার সাথে কাজ করতেন। তিনি বলেন, আমার কাজে আমাকে সাহায্য করতেন। আমার জামা'তী কাজে কখনো আপত্তি করেন নি। কখনো চাহিদা উত্থাপন করেন নি। সত্যিকার অর্থেই তিনি ওয়াকফ্-এর চেতনা যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। প্রত্যেক রমযানে তিনি অন্তত পক্ষে তিনবার আবার কখনো কখনো চারবার পবিত্র কুরআন অনুবাদসহ খতম করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর সম্মান এবং ভালোবাসা রাখতেন।

তার মা জেবুন নেসা সাহেবা বলেন, মরহুমা আমার সবচেয়ে ছোট মেয়ে ছিল। মেয়েটি সবাইকে অনেক ভালোবাসতো এবং মিশুক ছিল। আমাদের সবাইকে অনেক ভালোবাসতো, আমার সন্তানদের মাঝে (সে) সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ছিল। নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিল, জামা'তের সেবায় সর্বাগ্রে থাকত। হাফেযাবাদ গ্রামের পীরকোট সানীতে আমি লাজনার প্রেসিডেন্ট ছিলাম, সেখানে আমাকে কাজে অনেক সাহায্য করত। রাবওয়াতে এসেও জামা'তী কাজে সাহায্য করত।

(মরহুমার) ভাই কামরান শাহেদ বলেন, মরহুমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী বাফান্দার মিয়া নিজামুদ্দিন সাহেবের প্রপৌত্রি ছিল। ছোট-বড়ো সবার সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করত আর সবাইকে ভালোবাসত। আর খিলাফতের সাথে (তার) সুগভীর আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন। তার পিতামাতা ও (তার) স্বামী এবং ভাইবোনদেরও (ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন)।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো রাবওয়া নিবাসী মরহুম আব্দুল হামীদ খান সাহেবের স্ত্রী মেকাররমা রাজিয়া সুলতানা সাহেবার, যিনি আইভরি কোস্টের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ আব্দুল কাইয়্যুম পাশা সাহেবের মা ছিলেন। সম্প্রতি বিরানব্বই বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওষীয়্যত করেছিলেন। কাইয়্যুম পাশা সাহেব লিখেছেন, তিনি উকিলে আ'লা তাহরীকে জাদীদ মরহুম চৌধুরী হামীদুল্লাহ্ সাহেবের বড়ো বোন ছিলেন। (মরহুমার) পিতামাতা ১৯২৯ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। শুরু থেকেই রূহানী খাযায়েন পাঠের প্রতি গভীর আগ্রহী ছিলেন আর এভাবে তিনি তার জীবদ্দশায় বহুবার পুরো রূহানী খাযায়েন পাঠের পাশাপাশি তফসীরে কবীর ও অন্যান্য জামা'তী সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। তার নিজের

পাড়া দারুল উলুম ওয়াসতীর লাজনার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি মাল হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। (কাইয়্যুম পাশা সাহেব) বলেন, অধমের কতিপয় আত্মীয়স্বজন (আমার) মা-কে বলতেন, আপনার স্বামীও মৃত্যু বরণ করেছেন, একটিই ছেলে; তাকে জামেয়াতে মুরব্বী না বানিয়ে– যে কেবল মাসিক সামান্য ভাতা পাবে– অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করুন। (আমার) মা উত্তর দেন, সে জামেয়াতেই ভর্তি হবে! রিযিকের বিষয়টা হলো, খোদা তা'লা রিযিকদাতা (আর) তাঁর ওপর আমি আস্থা রাখি। (কাইয়্যুম পাশা সাহেব) বলেন, যখনই অবসর ভাতা বা অন্য কোনো মাধ্যমে কোনো টাকা পেতেন তৎক্ষণাৎ সেক্রেটারি মাল সাহেবের বাসায় গিয়ে নিজের ওসীয়্যতের চাঁদা পরিশোধ করতেন; সেক্রেটারি মাল সাহেবকে চাঁদা নেয়ার জন্য কখনও আমাদের বাড়িতে আসতে হয় নি। মৃত্যুর সময় তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, মরহুমার পুত্র অব্দুল কাইয়্যুম পাশা সাহেব আইভরি কোস্টের মিশনারী ইনচার্জ, কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে (তার) মায়ের জানাযাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং তার মায়ের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো লাহোর নিবাসী ডাক্তার মুহাম্মদ সেলীম সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা বুশরা বেগম সাহেবার, তিনি সিয়েরা লিওনের মুবাল্লিগ মুহাম্মদ নাঈম আযহার সাহেবের মা ছিলেন। সম্প্রতি আটাত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মূসীয়া ছিলেন। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন। তার ছেলে নাঈম আযহার সাহেব কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে (তার) মায়ের জানাযা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।। নাঈম আযহার সাহেব লিখেছেন, (আমার) মা জন্মগত আহমদী ছিলেন না, কিন্তু আহমদী আত্মীয়স্বজন ছিল আর তার মাঝে সত্য অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। আল্লাহ্‌র কাছে অনেক দোয়া করার ফলে তার হৃদয় আশ্বস্ত হয় এবং অবশেষে ১৯৬৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করেন আর সারা জীবন এই সম্পর্ক অতি বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছেন। আহমদীয়াতের জন্য সকল প্রকার কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক দোয়াকারী, পাঁচ ওয়াক্তের নামায ছাড়াও নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, সাহসী এবং দৃঢ়চিত্তের অধিকারিনী মহিলা ছিলেন। নীরবে কষ্ট সহ্য করতেন কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটুকুও করতেন না। যুগ-খলীফার প্রত্যেক আর্থিক কুরবানীর তাহরীকে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করতেন। জামা'তের চাঁদা নিয়মিত প্রথমদিকে পরিশোধ করে দিতেন। পরবর্তীতে অন্যান্য চাঁদায়ও অংশগ্রহণ করতেন। প্রত্যেক অভাবীকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করতেন। কাউকে কখনো খালি হাতে ফেরাতেন না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানদের স্বপক্ষে তার সকল দোয়া কবুল করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ নরওয়ের মোকাররম রশীদ আহমদ চৌধুরী সাহেবের। তিনি চৌধুরী গোলাম হোসেন সাহেবের সুপুত্র ছিলেন; সম্প্রতি ৮২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। অত্যন্ত দৃঢ়তা, সাহস ও ধৈর্যের সাথে নিজের অসুস্থতার মোকাবিলা করেন। বেশ কিছুকাল থেকে তিনি অসুস্থ ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী গোলাম হোসেন সাহেব ওভারসিয়ার ছিলেন; ১৯২৬ সালে স্বয়ং কাদিয়ান গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। দারুল কাযা কাদিয়ান এবং রাবওয়াতে কাজী হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। কেন্দ্রের স্থাপনাগুলোর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সেবাদানের সুযোগ পেয়েছেন। চৌধুরী রশীদ সাহেবেরও তার পিতার সাথে রাবওয়ার প্রাথমিক দিনগুলোতে সেবাদানের সৌভাগ্য হয়েছে। খিলাফতে সানীয়া এবং খিলাফতে সালেসার যুগে কাসরে খিলাফত এবং অন্যান্য পাকা স্থাপনায় ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে তিনি অনেক কাজ করেছেন। ১৯৭০ সালে তিনি নরওয়ে চলে যান। সেখানে জামা'তের সেবায় সর্বদা সম্মুখ সারিতে ছিলেন। তিনি নিঃস্বার্থ সেবাদান করেছেন। নরওয়ের প্রথম কেন্দ্রেও তার নিঃস্বার্থ সেবা রয়েছে। সেখানে কাজ করে তিনি জামা'তের অনেক অর্থ সাশ্রয় করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি নরওয়ের সেক্রেটারি উমুরে আম্মা হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন।

তার পুত্র জনাব মোজাফফর চৌধুরী এবং জনাব মুনাওয়ার চৌধুরী লিখেছেন: (আমাদের পিতার) খিলাফতের সাথে গভীর এবং অগাধ ভালোবাসা ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র নরওয়ে সফরের সকল দায়িত্ব তার স্কন্ধে অর্পিত হতো। হুযূর (রাহে.) তাকে তাঁর নরওয়ের গাইড বলে সম্বোধন করতেন। জুমুআর খুতবাতেও তিনি (রাহে.) তার সেবার কথা উল্লেখ করেন। খিলাফতের আসনে সমাসীন হওয়ার পর আমার সাথেও অকৃত্রিম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। পূর্বেই তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেই সম্পর্ক আরো গভীর হয়। তার পিতাও আমার পিতার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। আশৈশব চৌধুরী গোলাম হোসেন সাহেবকে আমরা দেখেছি। সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং খুব সুন্দর স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। চৌধুরী রশীদ সাহেবের আচার-আচরণ তার পিতার সাথে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সৃষ্টির সেবায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র এবং চারজন কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোকাররম এনামুল্লাহ্ কওসার সাহেবের ভগ্নিপতি ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা (তাদের) সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন। আমি পূর্বেও বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াবো, (ইনশাআল্লাহ্)।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)